01 SEP 2016

প্রথম আলো

হা শিক্ষা, হা পরীক্ষা!

যুক্তি তর্ক গল্প

আবুল মোমেন

শিক্ষা নিয়ে এ দেশে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে

আমাদের সমাজে পরীক্ষার মোহ এবং জিপিএ-৫-এর নেশা ধরিয়ে দেওয়া গেছে। মোহগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত মানুষ সহজে চলমান ব্যবস্থার ঘাটতি ও ক্ষতি ধরতে পারে না। একবার মনে হয়েছিল, পয়লা জুলাইয়ের গুলশান ট্র্যাজেডির পর মোহ কাটবে, নেশার ঘোরও ছুটবে। মুশকিল হলো, বর্তমানকালে মানুষ নগদপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসী। পরীক্ষা মানুষের সেই চাহিদা যেভাবে মেটাতে পারে, শিক্ষা তা পারে না। মানুষ অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষ হয়ে ওঠাকে গাছের বিকাশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গাছ মূল দিয়ে, পাতা দিয়ে মাটি, জল, সূর্যালোক থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে, সতেজ সুঠাম হয়ে বেড়ে ওঠে, যথাসময় ফল দিতে থাকে। আমরা শিশুর কাছেই ফল চাই—প্রথম শ্রেণি, আদতে প্রাক্-প্রাথমিক থেকেই ফল চাওয়া শুরু হয়ে যায়, একে তুলনা করা যায় অকালমাতৃত্বের সঙ্গে। অকালে ঘন ঘন গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করলে মেয়েটির আর সুস্থ স্বাভাবিক নারী হয়ে ওঠা হয় না, মানুষ হওয়া দূরের কথা। সে মেয়ে সমাজের অন্যায়-অনাচারে মানুষের জীবন গঠনের পথ হারিয়ে ফেলে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিশুকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে দাও। কিন্তু আমাদের যে তর সয় না, তার কাছে প্রথম থেকেই ফল চাই। তাই শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে শিশুকে সেই ছাঁচেই তৈরি করে নিচ্ছেন। পাঠ এবং সহপাঠ বিষয়গুলো শিশুকে জীবনের নানা উপচারে—যেমন বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা, মানবিক গুণাবলি, নান্দনিক বোধ, সম্পর্ক তৈরির দক্ষতা, রুচি, আচরণ, চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ করে তোলার কথা। কিন্তু এসবই অর্জন অনুশীলনসাপেক্ষ, তাই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের তো অত সময় নেই, আমরা পরীক্ষার ফল চাই—জিপিএ-৫। মোহ ও নেশার ঘোরে মানুষ খাদ্যকে অখাদ্যে রূপ দিতে পারে বা পরিমিত ডোজে যা ওষুধ, তার অপরিমিত ব্যবহার বাড়িয়ে বিষে পরিণত করতে পারে।

এ পরিণতি কোনো একটি সিদ্ধান্তের ফল নয়। বলা যায়, সরকার, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত অভিপ্রায় ও সম্মতিতেই আমরা এটি ঘটিয়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আজ শিক্ষা বলতে মানুষ বোঝে ডিগ্রি বা পরীক্ষার ফল। উচ্চ ডিগ্রিধারী 'অশিক্ষিত' মানুষে দেশ ভরে যাচ্ছে, নৈতিকতা ও নান্দনিকতার সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। এর কারণ শিক্ষা তো ডিগ্রি নয়—জ্ঞানচর্চার ভিত্তি তৈরি, জ্ঞানার্জন এবং এর মাধ্যমে চিন্তা, মনন ও মানসে উন্নত জীবন গঠনে সহায়তা দেওয়াই এর কাজ। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্বে ঘটে ডিগ্রি অর্জন—শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে তার গতিপথ ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ রাখা সংগত। এর তুলনা টানা যায় হার্ডল রেসের সঙ্গে—প্রতিবন্ধকটা মুখ্য নয়, দৌড়টাই মুখ্য। কারণ, জীবন আদতে আমৃত্যু দীর্ঘ দৌড়, যার পদে পদে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে।

জীবনের চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার জন্য আমাদের শিক্ষা তেমন কোনো পুঁজি দিতে পারে না। কারণ, জীবন তো আসলে পাঠ্যবিষয়ের প্রশ্নের উত্তর খোঁজে না, মানুষের কাছে জীবনের দাবি হলো বিচক্ষণতা, ন্যায়বোধ, সেবাপরায়ণতা, সংবেদনশীলতা, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসু মানস, শুভবোধ, মহত্ত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, উদ্যম, অভিনিবেশ ইত্যাদি নানান মানবিক গুণ এবং অবশ্যই বিভিন্ন দক্ষতা। আগেও লিখেছি, আবার বলি, আমাদের ব্যবস্থার গুণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ শিক্ষার্থী নেই, শিশু থেকে তরুণ সবাই মূলত আজ পরীক্ষার্থী।

পরীক্ষা-পাগল জাতি পাঠ্যবিষয়গুলোকে প্রশ্নে রূপান্তর করে নিয়েছে এবং এগুলোর তৈরি উত্তর মজুত করেছে। স্কুল এ কাজ করছে টিমেতালে অদক্ষতার সঙ্গে, তাই তৈরি পোশাকশিল্পের মতো কোচিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে, যারা দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের কাছে সম্ভাব্য প্রশ্নের তৈরি উত্তর পৌঁছানোর জন্য এক পায়ে খাড়া। পদ্ধতিটাকে বলা হয় মডেল টেস্ট। কোচিং সেন্টারে (স্কুলেও) পাঠ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় না, তাতে সময় নষ্ট; বরং ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে পরীক্ষার্থী হিসেবে রীতিমতো পাকা হয়ে ওঠে। সেটাই জিপিএ-৫-এর মোক্ষধামে পৌঁছানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

কিন্তু এই সাফল্যের খেসারত অনেক। এই ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষার চাপের মধ্যে থাকার ফলে অধিকাংশ শিশু নিজের এবং সেই সঙ্গে তাদের অভিভাবক সন্তানের, মৌলিক প্রবণতার হদিস পায় না, এ নিয়ে ভাবতেও শেখে না। তাতে দ্বিতীয় সমস্যাটা হয় শিশুটির পরিণত মানুষ হিসেবে সার্থকতার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কারও কোনো ধারণাই হয় না। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ছাত্র ক্রমাগত চাপে থেকে ভেতরে-ভেতরে হাঁপিয়ে ওঠে এবং তাই পড়াশোনা একটা অনিবার্য বোঝা হয়ে ছাত্রত্বকে তাদের জন্য কার্যত একপ্রকার দাসত্বে পরিণত করে। এভাবে দাস-ছাত্রের পুরো শিক্ষাজীবন কেটে যায় এই ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে। অধিকাংশের জন্য এ এক নিরানন্দ সশ্রম কারাদণ্ড। চতুর্থত, বোঝা নামালে শরীর কেবল হালকা হয় না, যা দুঃস্মৃতি তা মানুষ ভুলে যায়, ভুলে থাকতে অভ্যস্ত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা হয়ে শিক্ষারও এই পরিণতি হচ্ছে—প্রতি শ্রেণিতে অর্জিত শিক্ষা পুঞ্জীভূত হয়ে ছাত্র মানস-সম্পদে আর পরিণত হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, আজকাল শিশুরা পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ মনে রাখে না, হয়তো রাখতে পারে না। ফলে পৃথকভাবে প্রতিটি পরীক্ষার ফল ভালো করে চূড়ান্ত পর্বে অসাধারণ ডিগ্রি নিয়েও তাদের কাছ থেকে যথার্থ শিক্ষিতের আচরণ ও ভূমিকা পাওয়া যাবে না। মানুষ হিসেবে খুব মোটা দাগে দেশপ্রেম, মানবতার মতো পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হচ্ছে না মানুষ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, শিক্ষা নিয়ে এ দেশে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। অনেক ভালো ভালো ধারণা, যুগোপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়িতও হচ্ছে। পাঠ্যবই বা শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মানও খারাপ নয়। কিন্তু সবকিছুই বিফলে যায়, যখন শিক্ষা বলতে আমরা কেবল পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফলকেই বুঝি। অনেকেই, বিশেষত ধর্মীয় মৌলবাদের জঙ্গি রূপ দেখার পর, শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, বহুকাল ধরে সংস্কৃতিচর্চা বলতে আমরা গান-বাজনা, আবৃত্তি, নাচ ইত্যাদি ক্রিয়াত্মক শিল্পকে বুঝে আসছি। কার্যত এগুলো হলো আর্ট বা কলা। এর চর্চা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটির ব্যাপক ব্যঞ্জনাসহই আমাদের বোঝা দরকার। সংস্কৃতির সঙ্গে চর্চা বা অনুশীলনের যোগ গভীর। কোনো বিষয়ের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্যসহ বোঝার মাধ্যমে সে বিষয়টির ভেতরকার একজন হয়ে উঠলে বৈদগ্ধ্য অর্জিত হয়, জীবনের গভীরতর তাৎপর্য ধরা পড়ে, জগতের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঘটে। হীনতা ও ক্ষুদ্রতা কেটে সমৃদ্ধ মানুষ হওয়া যায়। ইনিই সংস্কৃতিমান ব্যক্তি। এতে দুটি গুণ অর্জিত হয়—বিষয়ের প্রতি অঙ্গীকার ও অনুরাগ জন্মায় এবং এ সম্পর্কে অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা জন্মায়। এর ফলে একটি বিষয় এভাবে বিস্তারিত অনুপুঙ্খে জানার কারণে একদিকে তৈরি হয় আত্মবিশ্বাস আর অন্যদিকে অর্জিত হয় বিনয়। বিনয়, কারণ যেকোনো বিষয় সম্পর্কে অধিকারী হয়ে ওঠার প্রস্তুতির নিষ্ঠা ও শ্রমের মূল্য জানা হয় বলে অন্য গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়।

আমরা ছাত্রদের কাছে অধিকারীর (authority) দক্ষতা চাই না, কিন্তু যেন তাদের ধারণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। দেশ নিয়ে কবিতা পড়ে ছাত্রকে যদি কেবল প্রশ্নের উত্তর শিখতে ব্যস্ত হতে হয়, তাহলে কবিতাটি ও সেই সূত্র ধরে দেশের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরূপ মনোভাব তৈরি হওয়া আশ্চর্যের নয়। এভাবে কবিতাটি পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য, ছাত্রের ব্যর্থ হয়ে যায়।

একজন শিক্ষার্থী দেশকে জানবে, তার ঐতিহ্য, কৃষ্টি, রীতিনীতি, বিশ্বাস সবই অনুযায়ী। এভাবেই উদ্ভিদবিজ্ঞান বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু তথ্য ও বিষয় ভালোবাসতে শিখবে, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কা নিজ হাতে কিছু কাজ করবে। তবেই না অনুসন্ধিৎসা, ভালোবাসা, অঙ্গীকার ইত্যাদি থাকলে সে মানুষটা আর নিছক ফলাফলমু না, তার মনোজগতে আরও অনেক অনুষ বিজ্ঞান হিসেবে সে পাঠ্যবইয়ে পড়ে, পরী নানাভাবে আমাদের জীবন ও জগৎ জড়ি বীজ, জলবায়ু—এভাবে সে দেখবে এ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এর সবই মা এভাবে সে আরও সব বিষয়ের সঙ্গে পরি শোনা, সাহিত্যপাঠ, চিত্রাঙ্কন, মডেল তৈরি হবে তেমনি কোনো প্রকল্প তৈরি, জাদুঘর খেলাধুলাও হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এভা হাত ধরাধরি করে চলবে।

এসবই স্বপ্নের মতো মনে হয় আমা নিই যে এমন স্বপ্নপূরণ আমাদের দেশে প্রথমত, অসম্ভব বলে সত্যিই কিছু নেই, ধাক্কায় পুরোপুরি অর্জিত হয় না, যা কর ঠিক করা। ঠিক করতে হবে আমাদের শি আমাদের প্রত্যাশা। আমরা যদি পরীক্ষার করে জীবনের পরিসরে অনুশীলনের বি পাল্টানো সহজ হবে। এতেও পরীক্ষা বলেছি, জীবনের দৌড়টা মুখ্য হলেও পেরোতে হবে, নয়তো জীবনপথের যাত্র

বর্তমান পদ্ধতিতে সরকার আইন ক ধরন পাল্টেও, কিন্তু নোট বই, কোচিং, পাল্টেনি। কারণ, পদ্ধতিরই উপজাত এ অংশীদার ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই যে লাভ ভালো হয়, শিক্ষকের বাড়তি অর্থাগম ঘ

মোট কথা, আমরা সবাই মিলে স্ব ডামাডোলে শিক্ষা অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হও

● আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাং

গুলশানে হলি
হামলার পর
পিঠা বিক্রেতা
অর্ধেকে নেমে
বিক্রি হতো
টাকার পিঠা।
২০০ থেকে
মো. আলী জ
পিঠাও আসে